بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১০ ডিসেম্বর, ২০২১ মোতাবেক ১০ ফাতাহ, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এ সম্পর্কে কিছু কথা উপস্থান করা এখনও বাকী আছে। কিছু কথা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রয়েছে, তাই বর্ণনা করা হয়, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলোকে একই ঘটনা বলে মনে হয়। কিছু (এমন কথা) এখন আমি বর্ণনা করব। উসদুল গাবাহ্ পুস্তকে হযরত আবু বকর (রা.)'র ইসলামগ্রহণের ঘটনার উল্লেখ এভাবে রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে একবার ইয়েমেন যাই আর **আয্দ** গোত্রের এক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির (বাড়িতে) আতিথেয়তা গ্রহণ করি। এই ব্যক্তি একজন আলেম ছিল, ঐশী গ্রন্থাবলীর জ্ঞান ছিল। আর মানুষের বংশবৃক্ষ বা বংশতালিকা সম্পর্কিত জ্ঞানে সে পারদর্শী ছিল। আমাকে দেখে সে বলে, আমার ধারণা হলো তুমি হেরেমের বা মক্কার অধিবাসী। আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি মক্কার অধিবাসী। অতঃপর সে বলে, তোমাকে আমি কুরাইশ গোত্রীয় বলে মনে করি। আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর সে বলে, আমি তোমাকে তায়েমী বলে মনে করি। আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি তায়েম বিন মুররাহ্ গোত্রের সদস্য, আমি হলাম আব্দুল্লাহ্ বিন ঊসমান আর ক্বাব বিন সা'দ বিন তায়েম বিন মুররাহ্'র সন্তান। এখানে এই নাম বলা যে, আব্দুল্লাহ্ বিন ঊসমান, আমার মনে হয় মহানবী (সা.) তখনও তার নাম আব্দুল্লাহ্ রাখেন নি। যাহোক রেওয়ায়েত হলো, আমার কাছে তোমার সম্পর্কে এখন কেবল একটি বিষয় বাকি আছে। আমি বললাম, তা কী? সে বলে, তুমি তোমার পেটের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে দেখাও। আমি বললাম, তুমি এটি কেন দেখতে চাইছ তা না বলা পর্যন্ত আমি এমনটি করব না। সে বলে, আমি সঠিক এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে বুঝতে পারছি যে, একজন নবী হারাম শরীফে আবির্ভূত হবেন। এক যুবক এবং একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁর কাজে তাঁকে সাহায্য করবে। যতদূর যুবকের সম্পর্ক রয়েছে, সে বিপদাপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং দুশ্চিন্তা নিরসনকারী হবে। বয়স্ক, ফর্সা এবং হালকা-পাতলা গড়নের হবে। তার পেটে তিল থাকবে। আর তার বাম উরুতে একটি চিহ্ন থাকবে। সে বলে তোমার জন্য আবশ্যক নয় যে, তুমি আমাকে তা দেখাবে যা আমি তোমার কাছে (দেখতে) চেয়েছি। তোমার মাঝে উপস্থিত বাকি সকল বৈশিষ্ট্য আমার জন্য পূর্ণ হয়ে গেছে, একটি ব্যতিরেকে, যা আমার অজানা। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তখন আমি তার জন্য আমার পেটের ওপর থেকে কাপড় সরালে সে আমার নাভির ওপর কালো তিল দেখতে পায় এবং বলে, কা'বার প্রভুর কসম! তুমিই সেই ব্যক্তি। আমি তোমার সামনে একটি বিষয় উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। অতএব, তুমি এই বিষয়ে সতর্ক থেকো। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তা কী। সে বলে, সাবধান, হিদায়াতকে অবজ্ঞা করো না আর আদর্শিক ও সর্বোৎকৃষ্ট পথকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখো। আর খোদা তা'লা তোমাকে যে ধনসম্পদ দান করবেন সে সম্পর্কে খোদা তা'লাকে ভয় করতে থেকো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আমি ইয়েমেনে নিজের কাজ সম্পন্ন করি। এরপর সেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে বিদায় জানানোর জন্য তার কাছে গেলে সে বলে, তুমি কি আমার এই পঙক্তিগুলো মুখস্থ করবে যেগুলো আমি সেই নবীর প্রশংসায় রচনা করেছি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে কয়েকটি পঙক্তি শোনায়। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এরপর আমি মক্কায় ফিরে আসি। আর ততদিনে মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব হয়ে গিয়েছিল। এরপর উতবা বিন আবি মুআয়েদ, শায়বা, রবিআ, আবু জাহল, আবু বাখতারি এবং কুরাইশদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আমার কাছে আসে। আমি তাদেরকে বলি, তোমাদের ওপর কি কোন বিপদ নেমে এসেছে, নাকি কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে যে, (তোমরা সবাই) দলবেঁধে উপস্থিত হয়েছ? তারা বলে, হে আবু বকর! অনেক বড় ঘটনা ঘটে গেছে। আবু তালেব এর এতীম (ভাতিজা) নবী হওয়ার দাবি করছে। আপনি না হলে আমরা তাঁর বিষয়ে (সিদ্ধান্ত গ্রহণে) কোন বিলম্ব করতাম না। এখন আপনি যেহেতু এসে গেছেন তাই এখন এ বিষয়ে আপনিই আমাদের আশা-ভরসা এবং আমাদের জন্য যথেষ্ট। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেই আর মহানবী (সা.) সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হয়, তিনি খাদীজা (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করছেন। আমি (সেখানে) গিয়ে দরজার কড়া নাড়ি। তিনি (সা.) বাইরে বেরিয়ে আসেন। এরপর আমি বলি, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কি আপনার পারিবারিক গৃহ পরিত্যাগ করেছেন আর আপনার পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন? মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! আমি আল্লাহ্‌র রসূল, তোমার প্রতিও এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতিও। অতএব, তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন কর। আমি বলি, (এই) দাবির সপক্ষে আপনার কাছে কী প্রমাণ আছে? মহানবী (সা.) বলেন, (প্রমাণ হলো) সেই বৃদ্ধ যার সাথে তুমি ইয়েমেনে সাক্ষাৎ করেছিলে। আমি বললাম, ইয়েমেনে তো অনেক বৃদ্ধ মানুষ ছিল; যাদের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি। মহানবী (সা.) বলেন, সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি, যিনি তোমাকে (কবিতার) পঙ্‌ক্তি শুনিয়েছিলেন। (এরপর) আমি নিবেদন করি, হে আমার প্রিয় বন্ধু! আপনাকে এই সংবাদ কে দিয়েছে? মহানবী (সা.) বলেন, সেই মহান ফিরিশ্‌তা; যিনি আমার পূর্ববর্তী নবীদের কাছেও আসতেন। আমি নিবেদন করি, আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে; আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর আপনি আল্লাহ্‌র রসূল। হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, এরপর আমি ফিরে যাই আর আমার ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মক্কার দুই পাহাড়ের মাঝে মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বেশি আনন্দিত আর কেউ হয় নি। এটি উসদুল গাবাহ্'র উদ্ধৃতি।

হতে পারে কোন কোন জায়গায় গল্প সাজানোর জন্য অনেকে বাড়িয়েও বলে, কিন্তু অনেক কথা সঠিকও হবে (হয়ত)। **রিয়াযুন নাযরা**'তে হযরত আবু বকর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনাটি এভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মহানবী (সা.)-এর ঘনিষ্ট ও নিষ্ঠাবান বন্ধু ছিলেন। তিনি (সা.) যখন (নবী হিসেবে) আবির্ভূত হন তখন কুরাইশ হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আসে আর বলে, হে আবু বকর! তোমার এই বন্ধু উন্মাদ হয়ে গেছে, নাঊযুবিল্লাহ্। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, ঘটনা কী? তখন তারা বলে, সে মসজিদে হারামে মানুষকে তৌহীদ অর্থাৎ, এক খোদার দিকে আহ্বান জানায় আর বলে, সে (নাকি) নবী! হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, তিনি কি সত্যিই একথা বলেছেন? (অর্থাৎ নবুয়্যতের দাবি করেছেন?) মানুষ বলে, হ্যাঁ, আর এই কথা তিনি মসজিদে হারামে (বসে) বলছেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর (বাড়ির) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং তাঁর দরজার কড়া নাড়েন, তাঁকে বাইরে ডাকেন। তিনি (সা.) যখন তাঁর সামনে আসেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আবুল কাসেম! আপনার সম্পর্কে আমি এ-কি শুনছি? মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! আমার সম্পর্কে তুমি কি শুনেছ? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি শুনেছি, আপনি আল্লাহ্‌র তৌহীদ বা একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন আর আপনি বলছেন, আপনি (নাকি) আল্লাহ্‌র রসূল? মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! হ্যাঁ; নিশ্চয় আমার মহাপ্রতাপান্বিত ও সম্মানিত খোদা আমাকে বশীর ও নাযীর (অর্থাৎ, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী) বানিয়েছেন। আর আমাকে ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রার্থনার প্রতিফল বানিয়েছেন, এবং আমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-কে বলেন, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি! আমি আপনাকে কখনও মিথ্যা বলতে দেখিনি বা শুনিনি। আপনি নিশ্চয় আপনার আমানতের মর্যাদা রক্ষা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা এবং উত্তম কর্মকাণ্ডের দরুন নবুয়্যতের অধিক যোগ্য। আপনার হাত বাড়িয়ে দিন যাতে আমি আপনার হাতে বয়আত করতে পারি, তখন মহানবী (সা.) নিজের হাত বাড়িয়ে দেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর হাতে বয়আত করেন আর তাঁর সত্যয়ন করেন ও স্বীকার করেন যে, আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য। আল্লাহ্‌র কসম! যখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান তখন তিনি কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও কালবিলম্ব করেন নি।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি যাকেই ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছি সে হোঁচট খেয়েছে ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছে এবং অপেক্ষা করেছে, কেবল আবু বকর ব্যতীত। আমি যখন তাঁর কাছে ইসলামের উল্লেখ করি তখন তিনি তা থেকে পিছু হটেন নি এবং এ সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্বেও ভোগেন নি। মহানবী (সা.) বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন আর তোমরা আমাকে বলেছ, তুমি মিথ্যাবাদী আর আবু বকর বলেছেন, (তুমি) সত্যবাদী এবং তিনি তাঁর প্রাণ ও সম্পদ সবকিছু দিয়ে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। এটি বুখারীর বর্ণনা। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র ইসলামগ্রহণের ঘটনা একস্থানে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

মহানবী (সা.) যখন নবুয়্যতের দাবি করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) (মক্কার) বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পর তাঁর (রা.) এক দাসী তাঁকে বলে, আপনার বন্ধু (নাঊযুবিল্লাহ্) উন্মাদ হয়ে গেছে এবং সে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছে। সে বলে, আমার প্রতি ঊর্ধ্বলোক থেকে ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয়। হযরত আবু বকর (রা.) তখনই উঠে পড়েন এবং মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁর (সা.) দরজায় কড়া নাড়েন। মহানবী (সা.) বাইরে আসেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আমি আপনাকে শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আপনি কি একথা বলেছেন যে, আপনার প্রতি খোদার ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয় এবং আপনার সাথে কথা বলে। তিনি (রা.) কোথাও হোঁচট না খান–একথা ভেবে মহানবী (সা.) বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হন। আমাদের ইতিহাসে সাধারণত এ বর্ণনাটিই অধিক প্রচলিত। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, আমাকে শুধু এতটুকু বলুন যে, আপনি একথা বলেছেন কি-না? মহানবী (সা.) পুনরায় এটি ভেবে যে, হয়ত তিনি (রা.) প্রশ্ন করবেন, ফিরিশ্‌তাদের আকৃতি কেমন হয়ে থাকেন এবং তারা কীভাবে অবতীর্ণ হয়? (তাই) প্রথমে ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা বলতে প্রয়াসী হন, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) পুনরায় বলেন, না, আপনি শুধু এটি বলুন যে, একথা সত্য কি-না? তখন তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, সত্য। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আমি আপনার প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনে যে বাধা দিয়েছি তার কারণ হলো, আমি চাচ্ছিলাম আমার ঈমান যেন অভিজ্ঞতালব্ধ হয়, এর ভিত্তি যেন দলিল-প্রমাণ নির্ভর না হয়। কেননা, আপনাকে সত্যবাদী ও সৎ হিসেবে মেনে নেয়ার পর কোন দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন থাকে না। মোটকথা, মক্কাবাসীরা যে কথা গোপন করেছিল সেটিকে হযরত আবু বকর (রা.) স্বীয় কর্মের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেন।

অপর একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র ইসলামগ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন, যেহেতু সেটি ভিন্ন বরাতে বর্ণনা করছেন তাই এর বিবরণ একটু ভিন্ন আর তাহলো, হযরত আবু বকর (রা.)'র ইসলামগ্রহণের বিষয়টি বড়ই বিস্ময়কর। যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি নবুয়্যতের দাবি করার নির্দেশ সম্বলিত ওহী হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) মক্কার এক নেতার বাড়িতে বসা ছিলেন। সেই নেতার দাসী এসে বলে, জানিনা খাদীজার কী হয়েছে। সে বলছে, আমার স্বামী সেভাবেই নবী যেমনটি ছিলেন হযরত মূসা (আ.)। মানুষ এই সংবাদ শুনে হাসাহাসি করতে থাকে এবং এরূপ কথা যারা বলে তাদেরকে উন্মাদ আখ্যায়িত করতে থাকে, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.), যিনি মহানবী (সা.)-এর অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ উঠে মহানবী (সা.)-এর দ্বারে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি কোন দাবি করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পৃথিবীবাসীর সংশোধনের জন্য আবির্ভূত করেছেন এবং শির্ক দূর করার আদেশ দিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) অন্য কোন প্রশ্ন না করে উত্তর দেন, আমি আমার পিতা-মাতার শপথ করে বলছি, আপনি কখনও মিথ্যা বলেন নি আর আমি মানতেই পারি না যে, আপনি আল্লাহ্ সম্পর্কে কোন মিথ্যা বলবেন, তাই আমি ঈমান আনছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই আর আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রসূল। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এমন যুবকদের সমবেত করে বুঝাতে শুরু করেন যারা তাঁর অর্থাৎ আবু বকর (রা.)'র পুণ্য এবং তাকওয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন, ফলে আরও সাতজন মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনেন আর তারা সবাই ছিলেন যুবক যাদের বয়স ছিল ১২ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।

আরেক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-কে একটি প্রমাণের ভিত্তিতে মেনেছেন। তাঁর (রা.) হৃদয়ে এক মুহূর্তের তরেও সন্দেহ জাগে নি। প্রমাণ সেটিই কিন্তু ঘটনার বর্ণনা কোন কোন স্থানে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়। সেই প্রমাণটি হলো, তিনি মহানবী (সা.)-কে আশৈশব দেখে এসেছেন এবং তিনি জানতেন যে, মহানবী (সা.) কখনও মিথ্যা বলেন নি, কখনও কোন দুষ্কৃতি করেন নি আর কখনও নোংরা ও অপবিত্র কথা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় নি। তিনি কেবল এতটুকুই জানতেন, এর বাইরে তিনি কোন শরীয়তকেও জানতেন না; যাতে উল্লিখিত মাপকাঠি অনুযায়ী তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-কে সত্য জ্ঞান করবেন, আর তিনি (রা.) কোন বিধানেরও অনুসারী ছিলেন না। তাঁর (রা.) জানাই ছিল না যে, আল্লাহ্‌র রসূল কী এবং তাঁর সত্যতার প্রমাণই বা কী! তিনি কেবল এতটুকুই জানতেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কখনও মিথ্যা বলেন নি। তিনি (রা.) কোন এক সফরে গিয়েছিলেন, ফেরার সময় পথিমধ্যেই কেউ তাঁকে

বলে যে, তোমার বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) দাবি করেছে যে, সে আল্লাহ্‌র রসূল। তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, সত্যিই কি তিনি (সা.) এই দাবি করেছেন? সেই ব্যক্তি বলে, হ্যাঁ। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তিনি (সা.) কখনও মিথ্যা বলেন না, তিনি যা-ই বলেন, সত্য বলেন। যিনি বান্দা সম্পর্কে কখনও মিথ্যা বলেন নি, তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে কীভাবে মিথ্যা বলতে পারেন? যেখানে তিনি মানুষের ক্ষেত্রে কোন তুচ্ছ অসৎ পন্থা অবলম্বন করেন নি, সেখানে এখন কীভাবে এত ঘৃণ্য অসৎ পন্থা অবলম্বন করতে পারেন যে, তাদের আত্মাকে ধ্বংস করে দেবেন। কেবলমাত্র এই প্রমাণের ভিত্তিতে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন আর এটি সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষকে বলে দাও فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (সূরা ইউনুস: ১৭) অর্থাৎ, দীর্ঘকাল আমি তোমাদের মাঝে বসবাস করেছি আর তোমরা দেখেছ, আমি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করি নি, এখন আল্লাহ্‌র সাথে কীভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি? হযরত আবু বকর (রা.) এই প্রমাণটিই নিয়েছেন এবং বলেছেন, তিনি (সা.) যদি বলে থাকেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল তাহলে তিনি সত্য বলেছেন এবং আমি তাঁর (সা.) প্রতি ঈমান আনছি। এরপর আবু বকর (রা.)'র হৃদয়ে কখনও কোন সন্দেহ জাগে নি এবং তিনি আর কখনও দোদুল্যমানও হন নি। তিনি বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, ধনসম্পদ এবং স্বদেশ ত্যাগ করতে হয়েছে এবং আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করতে হয়েছে কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সত্যতার বিষয়ে তাঁর (রা.) হৃদয়ে কখনও (কোন) সন্দেহের উদ্রেগ হয় নি।

{হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)} একবার বয়আতকারীদের পথনির্দেশ দিচ্ছিলেন, তাদেরকে বুঝাচ্ছিলেন আর এই বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা.)'র ঘটনা তুলে ধরেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে যে সিদ্দীক উপাধি দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, তাঁর (রা.) মাঝে কী কী উৎকর্ষ (গুণাবলী) ছিল। মহানবী (সা.) এ কথাও বলেছেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সেটিই যা তাঁর (রা.) হৃদয়ে বিরাজমান। আর যদি গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখা যায় তাহলে উপলব্ধি হয় যে, সত্যিকার অর্থেই হযরত আবু বকর (রা.) যে সততা দেখিয়েছেন, এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। আর সত্য কথা হলো, সকল যুগে যে ব্যক্তি সিদ্দীকের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায় তার জন্য আবশ্যক হলো, আবু বকর (রা.)'র বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নিজের মাঝে ধারণ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা আর এরপর যতটা সম্ভব দোয়া করা। যতক্ষণ পর্যন্ত আবু বকরসুলভ প্রকৃতির ছাপ গ্রহণ না করবে এবং সেই রঙে রঙিন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সিদ্দিকী উৎকর্ষ অর্জিত হতে পারে না। অতঃপর বলেন, আবু বকরসুলভ প্রকৃতি কী? সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও কথা বলার সুযোগ এখানে নেই, কেননা এটি সবিস্তারে বর্ণনা করার জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। তিনি (আ.) বলেন, আমি সংক্ষেপে একটি ঘটনা বর্ণনা করে দিচ্ছি এবং তা হলো, মহানবী (সা.) যখন নবুয়্যতের দাবি করেন, সে সময় হযরত আবু বকর (রা.) বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলেন। পথিমধ্যেই তাঁর সাথে জনৈক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি (রা.) তাকে মক্কার খবরাখবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং নতুন কোন সংবাদ আছে কিনা জানতে চান। রীতি হলো, মানুষ যখন ভ্রমণ শেষে ফেরত আসে তখন পথিমধ্যে কোন স্বদেশীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তার নিকট নিজ দেশের খবরাখবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাকে। সেই ব্যক্তি উত্তর প্রদান করে যে, নতুন বিষয় হলো, তোমার বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) নবুয়্যতের দাবি করেছে। হযরত আবু বকর (রা.) একথা শোনামাত্রই বলেন, যদি তিনি এই দাবি করে থাকেন তবে নিঃসন্দেহে তিনি সত্য। এই একটি ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর কীরূপ সুধারণা ছিল। নিদর্শন দেখারও প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। সত্য কথা হলো, নিদর্শন সে ব্যক্তিই দাবি করে যে দাবিকারকের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত থাকে এবং অপরিচিত ও অজানা থাকে এবং অধিক পরিচিতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত আছে তার জন্য নিদর্শন দেখার কী প্রয়োজন! বস্তুত হযরত আবু বকর (রা.) পথিমধ্যেই মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের দাবি শুনে ঈমান আনেন। এরপর মক্কায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আপনি কি নবুয়্যতের দাবি করেছেন? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, একথা সত্য। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আপনার প্রথম সত্যায়নকারী। তাঁর (রা.) এরূপ বলা কেবল বুলিসর্বস্ব ছিল না বরং তিনি অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.)

নিজ কর্মদ্বারা তা সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন এবং আমৃত্যু সেই অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন, এমনকি মৃত্যুর পরও (তাঁর) সঙ্গ ত্যাগ করেন নি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সূরা রহমানের আয়াত, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (সূরা আর্ রহমান: ৪৭) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার প্রভুর পদমর্যাদাকে ভয় করে তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে- এই আয়াতের তফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র উদাহরণ দেন এবং বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীককেই দেখ! যখন তিনি সিরিয়া থেকে ফেরত আসছিলেন তখন পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, কোন নতুন সংবাদ শোনাও। সেই ব্যক্তি উত্তর দেয় কোন নতুন সংবাদ নেই তবে তোমার বন্ধু নবুয়্যতের দাবি করেছে। এতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাকে উত্তর প্রদান করেন যে, যদি তিনি (সা.) নবুয়্যতের দাবি করে থাকেন তবে তিনি (সা.) সত্য বলেছেন। তিনি (সা.) কখনও মিথ্যাবাদী হতে পারেন না। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সোজা মহানবী (সা.)-এর গৃহে চলে যান এবং মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমিই সর্বপ্রথম আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারী। দেখুন! তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট কোন নিদর্শন (দেখানোর) দাবি করেন নি। শুধুমাত্র পূর্ব পরিচিতির কল্যাণেই তিনি ঈমান নিয়ে এসেছিলেন। স্মরণ রাখবে, নিদর্শনের দাবি কেবল তারাই করে যারা পরিচিতি রাখে না। যে শৈশবের বন্ধু, তার জন্য অতীতের অবস্থাই নিদর্শন হয়ে থাকে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) অনেক কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করেছেন, অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন। সবচেয়ে বেশি কষ্ট তাঁকে (রা.) দেয়া হয়েছে। আর তাঁকেই সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করা হয়েছে, তাই তাঁকেই সর্বপ্রথম নবুয়্যতের সিংহাসনে সমাসীন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এ জগতেই তাঁকে পুরস্কারে ভূষিত করেছেন আর পরকালে তো জান্নাত রয়েছেই। কোথায় সেসব ব্যবসা-বাণিজ্য যেখানে দিনভর তাঁকে কষ্ট করতে হয়েছে আর কোথায় এই পদমর্যাদা অর্থাৎ, তাঁকেই মহানবী (সা.)-এর পর প্রথম খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

অপর একস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মানুষ দু'ধরনের হয়ে থাকে। প্রথম হচ্ছে সেসব পুণ্যাত্মা, যারা সূচনাতেই মেনে নেন আর বিচক্ষণ ও দূরদর্শী হয়ে থাকেন যেমন ছিলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ছিলেন। আর আরেক প্রকার হলো, নির্বোধ লোক। মাথায় যখন কোন বিপদ এসে পড়ে তখন সম্বিৎ ফিরে পায় অর্থাৎ, যখন কোন বিপদে পড়ে, আযাব আসে, তখন ভাবে যে, মানা উচিত কি না?

মহানবী (সা.)-এর প্রতি সর্বপ্রথম কে ঈমান এনেছিলেন- তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.) নাকি হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)? কেউ কেউ এই সমাধান বের করেছেন যে, বালকদের মধ্যে আলী (রা.) প্রথম, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে আবু বকর (রা.) এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়েদ (রা.) প্রথম ঈমান আনয়নকারী ছিলেন। আল্লামা আহমদ বিন আব্দুল্লাহ্ এসব রেওয়ায়েতের মাঝে সামঞ্জস্য স্থাপন করে লিখেন,

হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন যদিও তিনি তখন বালক ছিলেন, যেভাবে তাঁর বয়স সম্পর্কে পূর্বেও উল্লেখ হয়েছে যে, তাঁর বয়স দশ ছিল বছর আর তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখেছিলেন। আর সর্বপ্রথম প্রাপ্তবয়স্ক আরব ব্যক্তি যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর এ বিষয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি ছিলেন, হযরত আবু বকর বিন আবী কোহাফা (রা.)। মুক্ত ক্রীতদাসদের মাঝে প্রথম ঈমান এনেছিলেন, হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)। এটি সর্বসম্মত বিষয়– যাতে কোনো দ্বিমত নেই।

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) বলেন,
মহানবী (সা.) দাবির পর যখন তাঁর ধর্ম প্রচার শুরু করেন, তখন সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.), যিনি এক মুহূর্তের তরেও দ্বিধান্বিত হন নি। হযরত খাদীজা (রা.)'র পর পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম কে ঈমান এনেছেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর আব্দুল্লাহ্ বিন আবী কোহাফা (রা.)। আবার কেউ কেউ বলেন, হযরত

আলী (রা.) বা যায়েদ বিন হারেসা (রা.)। কিন্তু তিনি (রা.) লিখেছেন, আমাদের মতে এই বিতর্ক অনাবশ্যক। হযরত আলী (রা.) ও যায়েদ বিন হারেসা (রা.) মহানবী (সা.)-এর গৃহবাসী ছিলেন এবং তাঁর সন্তানদের মতই তাঁর সঙ্গে থাকতেন। মহানবী (সা.) আদেশ দিতেন আর তাঁরা মান্য করতেন। মহানবী (সা.) যা বলতেন তা তারা বাড়ির সন্তান হিসেবে মানতেন। সম্ভবত সে সময় তারা ঈমান আনার বিষয়টিও এভাবেই শিরোধার্য করেছিলেন। এরপর তিনি (রা.) আরো লিখেন যে, এই দুই বালককে বাদ দিলে সর্বসম্মতভাবে হযরত আবু বকর (রা.) ঈমান আনার ক্ষেত্রে প্রথম এবং অগ্রগামী ছিলেন। যেমনটি নবী দরবারের কবি হাস্‌সান বিন সাবেত আনসারী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে বলেন,

إِذا تَذَكَّرتَ شَجواً مِن أَخي ثِقَةٍ

فَاذكُر أَخاكَ أَبا بَكرٍ بِما فَعَلا

خَيرَ البَرِيَّةِ أَتقاها وَأَعدَلَها

بَعدَ النَبِيِّ وَأَوفاها بِما حَمَلا

وَالثانِيَ الصادِقَ المَحمودَ مَشهَدُهُ

وَأَوَّلَ الناسِ مِنهُم صَدَّقَ الرُسُلا

অর্থাৎ, তোমার হৃদয়ে যখন তোমার কোন প্রিয় ভাইয়ের বেদনার স্মৃতি জাগ্রত হবে তখন তোমার ভাই আবু বকরকেও স্মরণ করো। তাঁর সেসব গুণের কারণে যেগুলো স্মরণ রাখার যোগ্য। মহানবী (সা.)-এর পর তিনি ছিলেন সবার মধ্যে সবচেয়ে মুত্তাকী এবং সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ। এছাড়া তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলী সর্বোত্তমভাবে পালন করেছেন। হ্যাঁ তিনিই তো আবু বকর (রা.) যিনি সওর গুহায় মহানবী (সা.)-এর সাথে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন, যিনি নিজেকে তাঁর আনুগত্যে পুরোপুরি বিলীন করে রেখেছিলেন এবং তিনি যে কাজেই হাত দিতেন তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন। তিনি সেসব লোকের মধ্যে প্রথম ছিলেন, যিনি রসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর ভদ্রতা ও যোগ্যতার কারণে কুরাইশদের মাঝে অনেক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আর ইসলামে তিনি সেই সম্মান অর্জন করেছেন যা অন্য কোন সাহাবী অর্জন করতে পারে নি। হযরত আবু বকর (রা.) এক মুহূর্তের জন্যও মহানবী (সা.)-এর দাবির প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন নি বরং শোনামাত্রই গ্রহণ করেছেন। এরপর তাঁর পুরো মনোযোগ এবং প্রাণ ও ধনসম্পদকে মহানবী (সা.)-এর আনীত ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেছেন। মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তিনিই তাঁর প্রথম খলীফা হন। নিজ খিলাফতের যুগেও তিনি তাঁর অতুলনীয় যোগ্যতার প্রমাণ রাখেন।

হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে ইউরোপের বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ স্প্রিংগার লিখেন,

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)'র ঈমান আনা এই বিষয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, মুহাম্মদ (সা.) প্রতারিত হতে পারেন কিন্তু কখনোই প্রতারক ছিলেন না বরং নিজেকে তিনি সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে খোদার রসূল বিশ্বাস করতেন। স্যার উইলিয়াম মুইরও স্প্রিংগারের এই মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন– হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এটি লিখেছেন।

ইসলামের তবলীগ এবং এর কারণে হযরত আবু বকর (রা.)-কে কেমন কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়েছে সে সম্পর্কে উসদুল গাবাহ্ পুস্তকে হযরত আবু বকর (রা.)

সম্পর্কে লেখা রয়েছে, ইসলামের আবির্ভাবের পর তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর তবলীগে একদল লোক ইসলাম গ্রহণ করেন, সেই ভালোবাসার কারণে যা হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতি তাদের ছিল আর সেই আকর্ষণের কারণে যা হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতি তাদের ছিল। এমনকি **আশারায়ে মুবাশ্বারা**'র পাঁচজন সাহাবী তাঁর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র তবলীগে ইসলামগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন, হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)।

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) তাঁর সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লিখেন, হযরত খাদীজা (রা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র পর ইসলামগ্রহণকারীদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন যারা হযরত আবু বকর (রা.)'র তবলীগে ঈমান এনেছিলেন আর তাঁরা প্রত্যেকে ইসলামের ইতিহাসে এমন মহিমান্বিত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী প্রমাণিত হয়েছেন যে, তাঁদেরকে শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের মাঝে গণ্য করা হয়। তাঁদের নামগুলো হচ্ছে– প্রথমত হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.) যিনি উমাইয়া বংশদ্ভুত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৩০ বছর। হযরত উমর (রা.)'র পর তিনি মহানবী (সা.)-এর তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত উসমান (রা.) অত্যন্ত লাজুক, বিশ্বস্ত, কোমল হৃদয়ের অধিকারী, বদান্যশীল এবং সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি ইসলামের ব্যাপক আর্থিক সেবা করেছেন। মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে কতটা ভালোবাসতেন তা এ বিষয়ের মাধ্যমেও অনুমান করা যায় যে, তিনি (সা.) তাঁর দুই কন্যাকে পর পর তাঁর কাছে বিয়ে দেন, যার ফলে তাঁকে **যুন্ নূরায়েন** তথা দুই নূরের অধিকারীও বলা হয়।

দ্বিতীয়জন হলেন, আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)। তিনি বনু যোহরা গোত্রের সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর মাতাও এ বংশেরই ছিলেন। খুবই বুদ্ধিমান ও সভ্য প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হয়েছিল। ইসলামগ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৩০ বছর। হযরত উসমান (রা.)'র যুগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তৃতীয়জন হলেন, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)। তখন তিনি টগবগে যুবক ছিলেন, অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স কেবল **১৯** বছর ছিল। তিনিও বনু যোহরা গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বাহাদুর ছিলেন। তাঁর হাতেই হযরত উমর (রা.)'র যুগে ইরাক বিজয় হয়। আমীর মুয়াবিয়ার যুগে তাঁর মৃত্যু হয়।

চতুর্থজন হলেন, যুবায়ের বিনু আওয়াম (রা.)। তিনি মহানবী (সা.)-এর ফুফাতো ভাই ছিলেন, অর্থাৎ আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা সুফিয়ার পুত্র ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র জামাতা হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বনু আসাদ গোত্রের সদস্য ছিলেন। ইসলামগ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র **১৫** বছর। পরিখার যুদ্ধের সময় একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনের কারণে মহানবী (সা.) যুবায়ের (রা.)-কে হাওয়ারী উপাধিতে ভূষিত করেন। হযরত আলী (রা.)'র খিলাফতকালে **'জঙ্গে জামাল'** বা **'উটের যুদ্ধে'** যুবায়ের (রা.) শাহাদত বরণ করেন।

পঞ্চম ব্যক্তি হলেন, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র বংশ, অর্থাৎ বনু তায়েম গোত্রের সদস্য ছিলেন। সেই যুগে তিনিও টগবগে তরুণ ছিলেন। হযরত তালহা (রা.)ও ইসলামের বিশেষ নিবেদিতপ্রাণ লোকদের একজন ছিলেন। হযরত আলী (রা.)'র খিলাফতকালে **'জঙ্গে জামাল'** বা **'উটের যুদ্ধে'** তিনি শহীদ হন।

এই পাঁচজন সাহাবীই **'আশারায়ে মুবাশ্বারা'**র- অর্ন্তগত। অর্থাৎ সেই দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র ভাষায় বিশেষভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁরা মহানবী (সা.)-এর অত্যন্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত সাহাবী এবং উপদেষ্টা গণ্য হতেন।

মক্কার কাফিররা ইসলামগ্রহণকারীদের ওপর বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়েছে। শুধুমাত্র দুর্বল ও দাস শ্রেণির মুসলমানরাই যে তাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তা নয় বরং স্বয়ং মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)ও মক্কার মুশরিকদের নিপীড়ন ও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পান নি। ইতিহাস এর সাক্ষী যে, তাঁদেরকেও, অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কেও বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার ও নিপীড়নের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয়েছে। সীরাতে হালাবিয়াতে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে আর সেটি হলো, হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.) যখন তাঁদের ইসলামগ্রহণের কথা প্রকাশ করেন তখন নওফেল বিন আদাভিয়া তাঁদের উভয়কে পাকড়াও করে। এই লোককে কুরাইশদের বাঘ বলা হত। সে তাঁদের দু'জনকে একই রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। তাঁদের গোত্র বনু তায়েমও তাঁদেরকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে নি। এজন্য হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত তালহা (রা.)-কে **কারীনায়েন**-ও বলা হয় অর্থাৎ, একসূত্রে গ্রথিত দু'সাথী। নওফেল বিন আদাভিয়া'র শক্তি ও তার অত্যাচারের কারণে মহানবী (সা.) বলতেন, **আল্লাহুম্মাকফিনা শার্‌রাবনিল আদাভিয়া** অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! ইবনে আদাভিয়া'র অনিষ্টের বিপরীতে তুমি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও।

উরওয়া বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আ'স (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি, আপনি আমাকে সেই বর্বর আচরণের কথা বলুন যা মুশরিকরা মহানবী (সা.)-এর সাথে করেছিল। তিনি বলেন, একবার মহানবী (সা.) মসজিদে হারামের অঙ্গনে নামায আদায় করছিলেন, তখন উকবা বিন আবী মু'ঈদ আসে এবং তাঁর (সা.) ঘাড়ে কাপড় পেঁচিয়ে জোরে গলা চেপে ধরে। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে পৌঁছে যান এবং উকবার ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলেন, أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ অর্থাৎ, **তোমরা কি একারণে এক ব্যক্তিকে হত্যা করছ যে বলে আল্লাহ্ আমার প্রভু?**

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, একবার মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে বলে, তুমি কি আমাদের উপাস্য সম্পর্কে একথা বলো নি? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ। পরক্ষণে তারা তাঁর চতুর্দিকে সমবেত হয়। সেসময় কেউ একজন হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে, নিজের বন্ধুর খবর নাও। হযরত আবু বকর (রা.) বের হন এবং মসজিদে হারামে পৌঁছেন। তিনি গিয়ে দেখেন, লোকেরা একত্রিত হয়ে মহানবী (সা.)-কে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমরা ধ্বংস হও! أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ (সূরা আল্ মো'মেন: ২৯)। অর্থাৎ, তোমরা কি কেবল একারণে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে, সে বলে আল্লাহ্ আমার প্রভু এবং সে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে

স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছে? এরপর তারা মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে দেয় এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র ওপর হামলে পড়ে এবং তাঁকে মারতে থাকে। হযরত আবু বকর (রা.)'র মেয়ে আসমা বলেন, তিনি আমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসেন যে, তিনি তাঁর চুলে হাত দিলে সেগুলো হাতে উঠে আসতো। আর তিনি বলেন, **'তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম'**। অর্থাৎ, হে মহাপ্রতাপশালী এবং মহা সম্মানের অধিকারী! তুমি আশিসমণ্ডিত।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, তারা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মাথা এবং দাড়ি মোবারক ধরে এত জোরে টেনেছিল যে, তাঁর (সা.) অধিকাংশ চুল উঠে যায়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে (সা.) বাঁচানোর জন্য চলে আসেন আর তিনি বলছিলেন, أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ (সূরা আল্ মো'মেন: ২৯)। অর্থাৎ, তোমরা কি কেবল এ কারণে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে, সে বলে আল্লাহ্ আমার প্রভু? তোমরা কি এই ব্যক্তিকে কেবল এজন্য হত্যা করতে চাও যে, সে বলে আল্লাহ্ আমার প্রভু? একইসাথে হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদছিলেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! তাদেরকে ছেড়ে দাও। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি যাতে আমি উৎসর্গিত হয়ে যাই। এরপর তারা অর্থাৎ কাফিররা মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে দেয়।

হযরত আলী (রা.) একবার লোকদের জিজ্ঞেস করেন, হে লোকসকল! লোকদের মাঝে সর্বাধিক সাহসী কে? লোকেরা উত্তরে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমার বিষয়টি হলো, যে আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তার প্রতি আমি সুবিচার করেছি অর্থাৎ, তাকে মেরে ধরাশায়ী করেছি। কিন্তু সত্যকথা হলো, সর্বাধিক সাহসী ব্যক্তি হলেন হযরত আবু বকর (রা.)। আমরা বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর জন্য তাঁবু খাঁটাই। অতঃপর আমরা বলি, কে আছে যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে থাকবে যেন তাঁর (সা.) নিকট কোন মুশরিক পৌঁছুতে না পারে? অতএব, আল্লাহ্‌র কসম! মহানবী (সা.)-এর নিকট কেউ গেল না, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) স্বীয় তরবারি হাতে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট দণ্ডায়মান হন অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর নিকট কোন মুশরিক আসতে পারবে না যতক্ষণ না তার সাথে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.)-এর মোকাবিলা হয়। কাজেই, তিনিই সর্বাধিক সাহসী ব্যক্তি।

একবারের ঘটনা, হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি দেখি, কুরাইশরা মহানবী (সা.)-কে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। কেউ তাঁর (সা.) প্রতি ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছিল, কেউবা তাঁকে উত্যক্ত করছিল আর বলছিল, তুমি সকল উপাস্যকে এক উপাস্য বানিয়ে বসেছ। আল্লাহ্‌র কসম! যে-ই মহানবী (সা.)-এর কাছে আসত তাদের কাউকে আবু বকর (রা.) মেরে প্রতিহত করতেন, কাউকে শক্ত কথার মাধ্যমে প্রতিহত করতেন আর বলতেন, তোমরা ধ্বংস হও। أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ (সূরা আল্ মো'মেন: ২৯)। অর্থাৎ, তোমরা কি কেবল এ কারণে এই ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে, সে বলে আল্লাহ্ আমার প্রভু-প্রতিপালক? অতএব, হযরত আলী (রা.) নিজের চাদর সরিয়ে এতটা কাঁদেন যে, তাঁর দাড়ি অশ্রুশিক্ত হয়ে যায়। পুনরায় বলেন, আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি! ফিরাউনের জাতির মু'মিন উত্তম ছিল নাকি হযরত আবু বকর (রা.)? সম্ভবত হযরত আলী (রা.)'র ফিরাউনের জাতির মু'মিনের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, পবিত্র কুরআনে ফিরাউনের জাতির সেই ব্যক্তির সাথে এ আয়াত সম্পৃক্ত যে নিজের ঈমান গোপন করেছিলেন আর তিনি ফিরাউনের দরবারে এই কথা বলছিলেন যে, أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ (সূরা আল্ মো'মেন: ২৯)। একথা শোনার পর উপস্থিত

সবাই নীরব হয়ে যায়। হযরত আলী (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! হযরত আবু বকর (রা.)'র এক মুহূর্ত ফিরাউনের জাতির মু'মিনের সারা জীবনের পুণ্যের চেয়ে উত্তম। কেননা সে নিজ ঈমানকে গোপন করেছিল আর এই ব্যক্তি অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.) নিজ ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা যখন মহানবী (সা.)-এর জীবনের ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করি, এই দাবির সত্যতা আমাদের দৃষ্টিপটে আসে এবং আমরা পদে পদে এমন ঘটনা দেখতে পাই যা মানবজাতির প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা এবং স্নেহের প্রমাণ বহন করে। যেমন, এক আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছানোর জন্য বছরের পর বছর তাঁকে এমন কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে যে, যার কোন সীমা পরিসীমা নেই।

একবার কা'বার প্রান্তরে কাফিররা তাঁর গলায় রশি পেঁচিয়ে এত জোড়ে টানছিল যে, তার চোখ রক্তবর্ণ হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসে। হযরত আবু বকর (রা.) একথা শুনেই ছুটে আসেন আর মহানবী (সা.)-কে এই কষ্টের মাঝে দেখে তাঁর চোখে পানি এসে যায় আর তিনি কাফিরদের দূরে সরিয়ে দিয়ে বলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তোমরা কি এই ব্যক্তিকে কেবল এজন্য নির্যাতন করছ যে, সে বলে, আল্লাহ্ আমার প্রভু প্রতিপালক?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"একবার একদল শত্রু মহানবী (সা.)-কে একাকী পেয়ে ঘিরে ধরে এবং তাঁর গলায় রশি পেঁচিয়ে তা টানতে থাকে। যার দরুন তাঁর (সা.) প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। দৈবক্রমে হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে আসেন আর তিনি তাঁকে অনেক কষ্টে মুক্ত করেন। এরপর তারা আবু বকর (রা.)-কে এত বেশি প্রহার যে, তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।"**

ক্রীতদাসদের মুক্ত করার ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর কাছে চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল। তিনি এই সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করেন এবং সেই সাত ব্যক্তিকে মুক্ত করেন যাদের আল্লাহ্‌র কারণে কষ্ট দেয়া হত। তিনি হযরত বিলাল (রা.), আমের বিন ফুহাইরা (রা.), যিন্নিরাহ্ (রা.), নাহদীয়া (রা.) এবং তাঁর মেয়ে বানি মোমেল এর দাসী এবং উম্মে আবায়েসকে মুক্ত করেন।

হযরত বিলাল (রা.) বনু জুমাহ্'র ক্রীতদাস ছিলেন আর উমাইয়া বিন খালফ তাঁকে চরম কষ্ট দিতো। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, যখন হযরত বিলাল (রা.) ঈমান আনেন তখন তাঁকে তাঁর মালিক ধরে মাটিতে শুইয়ে দেয় এবং তাঁর ওপর পাথরের টুকরো এবং গরুর চামড়া চাপিয়ে দেয় এবং বলে, লাত এবং উযযা তোমার প্রভু কিন্তু তিনি **"আহাদ" "আহাদ"** উচ্চারণ করতে থাকতেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর নিকট আসেন ও কাফিরদের বলেন, তোমরা আর কতদিন এই ব্যক্তিকে কষ্টে জর্জরিত করতে থাকবে? বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) ৭ অওকিয়ার বিনিময়ে হযরত বেলাল (রা.)-কে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। অর্থাৎ, যেহেতু ১ অওকিয়া সমান ৪০ দিরহাম। সে অনুযায়ী ২৮০ দিরহামের বিনিময়ে তাঁকে ক্রয় করেছিলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু বকর! আমাকেও এতে অংশীদার করে নাও। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি তাকে মুক্ত করে দিয়েছি।

হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.) একজন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তোফায়েল বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সাখবারাহ্'র ক্রীতদাস ছিলেন, যে মাতৃসম্পর্কের দিক থেকে

হযরত আয়েশা (রা.)'র ভাই ছিলেন। হযরত আমের (রা.) সর্বাগ্রে ইসলামগ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। তাঁকে আল্লাহর রাস্তায় অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

হযরত যিন্নিরাহ্ রুমী (রা.), প্রাথমিক যুগে ইসলামগ্রহণকারী মহিলাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলামধর্মে যোগ দিয়েছিলেন। মুশরিকরা তাঁকে অনেক কষ্ট দিত। বলা হয়, তিনি বনু মাখযুম গোত্রের দাসী ছিলেন এবং আবু জাহল তাঁকে অনেক অত্যাচার করত। এটিও বলা হয়ে থাকে, তিনি বনু আব্দুদ্ দ্বারের দাসী ছিলেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। এ কারণে মুশরিকরা বলে, **লাত** ও **উয্যাকে** অস্বীকার করার দরুণ তারা যিন্নিরাহ্'র দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে। একথা শুনে হযরত যিন্নিরাহ্ (রা.) বলেন, **লাত** ও **উয্যা** তো এটিও জানে না যে, কে তাদের উভয়ের উপাসনা করে। তারা নিজেরাই তো অন্ধ, আমাকে কি অন্ধ করবে? এটি তো ঐশী তকদীর। খোদা তা'লার অভিপ্রায় এটি যে, আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেছে আর আমার খোদা আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন; তিনি কাফিরদের এই উত্তর দেন। এ অবস্থায়ই সেই রাত অতিক্রান্ত হয়। পরেরদিন সকালে তিনি জাগ্রত হয়ে দেখেন, আল্লাহ তা'লা তাঁকে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন। এটি দেখে কুরাইশরা বলে, মুহাম্মদের জাদুবলে এটি সম্ভব হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর প্রতি নির্যাতনের দৃশ্য দেখে তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

এই স্মৃতিচারণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। ক্রীতদাস মুক্তির আরো কিছু ঘটনা রয়েছে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)